

আলোকচিত্রে কৃষি প্রতিবেশ

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ



Research Initiatives, Bangladesh (RIB)

Research Initiatives, Bangladesh (RIB) was founded to promote knowledge on poverty alleviation that is relevant, useful, innovative, participatory and action oriented, with a special focus on marginalized and socially excluded communities. RIB views poverty as a multidimensional process and recognizes that the needs of poverty groups go beyond simple income generation, food and shelter, to areas such as equality, dignity, justice, human rights and good governance. RIB supports marginalized and minority groups who are unable to access basic services due to social discrimination and conduct people's research (*Gonogobeshona*) on the development schemes that affects them most, in order to develop ownership and generate community mobilization.

For RIB's publication: <https://rb.gy/x4tbqh>

For Videos: <https://www.youtube.com/@researchinitiativesbanglad7871/videos>



Rosa Luxemburg Stiftung (RLS)

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) is a political foundation from Germany that works within the tradition of workers' and women's struggles. Bearing the name of Democratic Socialist Rosa Luxemburg (1871-1919), the foundation serves as a forum for debate and critical thinking about political alternatives, as well as a research centre for progressive social development. RLS promotes the discourse among activists, scientists and intellectuals from South Asia and Germany as well as from other regions of the world. A special focus lies on creating networks among countries of the Global South. The foundation also provides space for critical discourse and publishes educational material. For more information please visit : www.rosalux.in

আলোকচিত্রে কৃষি প্রতিবেশ

সম্পাদনায়
সুরাইয়া বেগম
নাভিদ আনজুম হাসান
মোঃ ইফতেখার আলী

**RESEARCH
INITIATIVES
BANGLADESH**



**ROSA
LUXEMBURG
STIFTUNG**
SOUTH ASIA

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ

আলোকচিত্রে কৃষি প্রতিবেশ Photobook on Agroecology

সম্পাদনা: Edited by:
সুরাইয়া বেগম Suraiya Begum
সৈয়দ নাভিদ আনজুম হাসান Syed Navid Anjum Hasan
মোঃ ইফতেখার আলি Md. Iftekhhar Ali

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৩ Published in: December 2023

প্রকাশনায়: Published by:
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) Research Initiatives, Bangladesh
বাসা ০৭ (কাজলী), সড়ক ১৭, ব্লক সি House 07, Road 17, Block C,
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ Banani, Dhaka-1213, Bangladesh
ফোন : (+৮৮০-২) ২২২২৭৪০৫১ Phone: (+880-2) 222274051
ই-মেইল : rib@citech-bd.com; ওয়েবসাইট : www.rib-bangladesh.org
YouTube: Research Initiatives, Bangladesh RIB

সহায়তায়: Supported by:
রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং Rosa Luxemburg Stiftung
স্ট্রেসে দের প্যারিসের কমিউন ৮এ Straße der Pariser Kommune 8A
১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী 10243 Berlin, Germany

আলোকচিত্র: Photography:
শাহদাত হোসেন ইমরান Shahdat Hossen Imran
রিইব আর্কাইভস RIB Archives

মুদ্রণে: Printed by:
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড Dana Printer Limited
গ-১৬, মহাখালী বা/এ, Ga-16, Mohakhali C/A,
বনানী, ঢাকা-১২১৩ Banani, Dhaka-1213

Sponsored by the Rosa Luxemburg Stiftung with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany. The publication or parts of it can be used by others for free as long as they provide a proper reference to the original publication. The content of the publication is the sole responsibility of the author of the RIB and does not necessarily reflect the position of RLS.

মুখবন্ধ

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গতানুগতিকতার বাইরে প্রাথমিক চিন্তা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। যার মধ্যে শিক্ষা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, অধিকার ও অংশগ্রহণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ (মানবিক ও অর্থনৈতিক) এবং কৃষি অন্যতম।

কৃষি আমাদের দেশের ঐতিহ্য এবং অর্থনৈতিক বলয়কে কেন্দ্র করে মানব জীবনযাপনের অন্যতম ক্ষেত্র। সর্বোপরি কৃষির সাথে দেশজ এবং বৈশ্বিক রাজনীতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। জ্ঞানতত্ত্বে কৃষি তাই যেমন গুরুত্বপূর্ণ, রিইব-এর কাজের পরিসরেও তেমনি কৃষি বিষয়ক গবেষণা অনন্য মর্যাদায় আসীন। রিইব বাংলাদেশের কৃষি নিয়ে কয়েকটি জেলার কৃষকদের সাথে বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করেছে। তার মধ্যে কৃষি প্রশ্ন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ভূমি ব্যবহার ও কৃষি প্রতিবেশ উল্লেখ্য। এই কাজের আওতায় বগুড়া, সাতক্ষীরা ও ঢাকায় কৃষক সমাজের সমস্যা, জনস্বাস্থ্য, মাটি-পানি-জীবন তথা কৃষি পরিবেশের সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, সুস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থা এবং খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিয়ে আলোচনা-পরামর্শ ও দক্ষতা-বৃদ্ধিমূলক কর্মশালার ব্যবস্থা এবং জ্ঞান চর্চা অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়াও গণগবেষণা পদ্ধতির চর্চার মাধ্যমে একশন রিসার্চমূলক কাজ এবং প্রকাশনার মাধ্যমে জ্ঞান চর্চা করাও রিইব এর নিগূঢ় উদ্দেশ্য।

‘কৃষি প্রতিবেশ’ বিষয়টি যখন থেকে মানুষ ভূমি কর্ষণ করা শুরু করেছে তখন থেকেই এর শুরু। বৈশ্বিক পরিসরে শিল্পবিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত এর এক ধরনের ঐতিহ্য ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে প্রযুক্তি যত বেশি প্রসারিত হয়েছে প্রতিবেশ তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে বৈশ্বিক রাজনীতির কারণে বাংলাদেশের মতো দেশগুলো যে ধরনের প্রতিবেশগত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং এই ক্ষতিগুলো যে কৃষকদেরকে সরাসরি প্রভাবিত করছে তাকে তুলে ধরা এবং এই সংক্রান্ত জ্ঞান কৃষক ও অন্যদের সাথে বিনিময় করা এসব প্রকাশনার উদ্দেশ্য।

এছাড়াও রাষ্ট্রীয় পরিসরে বিভিন্ন সেক্টরে নীতি নির্ধারক পর্যায়ে যারা কাজ করছেন তাঁদের কাছেও আমাদের এই বক্তব্যগুলো তুলে ধরতে হবে যাতে নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুস্থায়ী কৃষি পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হতে পারে। রিইব তাই সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে আগ্রহী। এই সম্মিলিত প্রয়াস আমাদের কৃষি প্রতিবেশকে সুস্থায়ী ও টেকসই করবে, যাতে এই ধরিত্রীর প্রতিবেশ সুস্থ থাকে, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য থাকে।

এই ফটোরুবুকে গত কয়েক বছর ধরে রিইব কৃষি, কৃষক ও কৃষি-প্রতিবেশ নিয়ে যে প্রক্রিয়ায় এবং যেসকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে এবং যে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তারই সচিত্র সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে “Transformation towards Ecological and Gender Justice and Sustainability (2023-2024)” প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং অর্জনকে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা প্রকল্পের কাজের এবং সহকর্মীদের ক্রমাগতভাবে অগ্রসরমানতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি লক্ষ্য করছি, যা আশাপ্রদ।

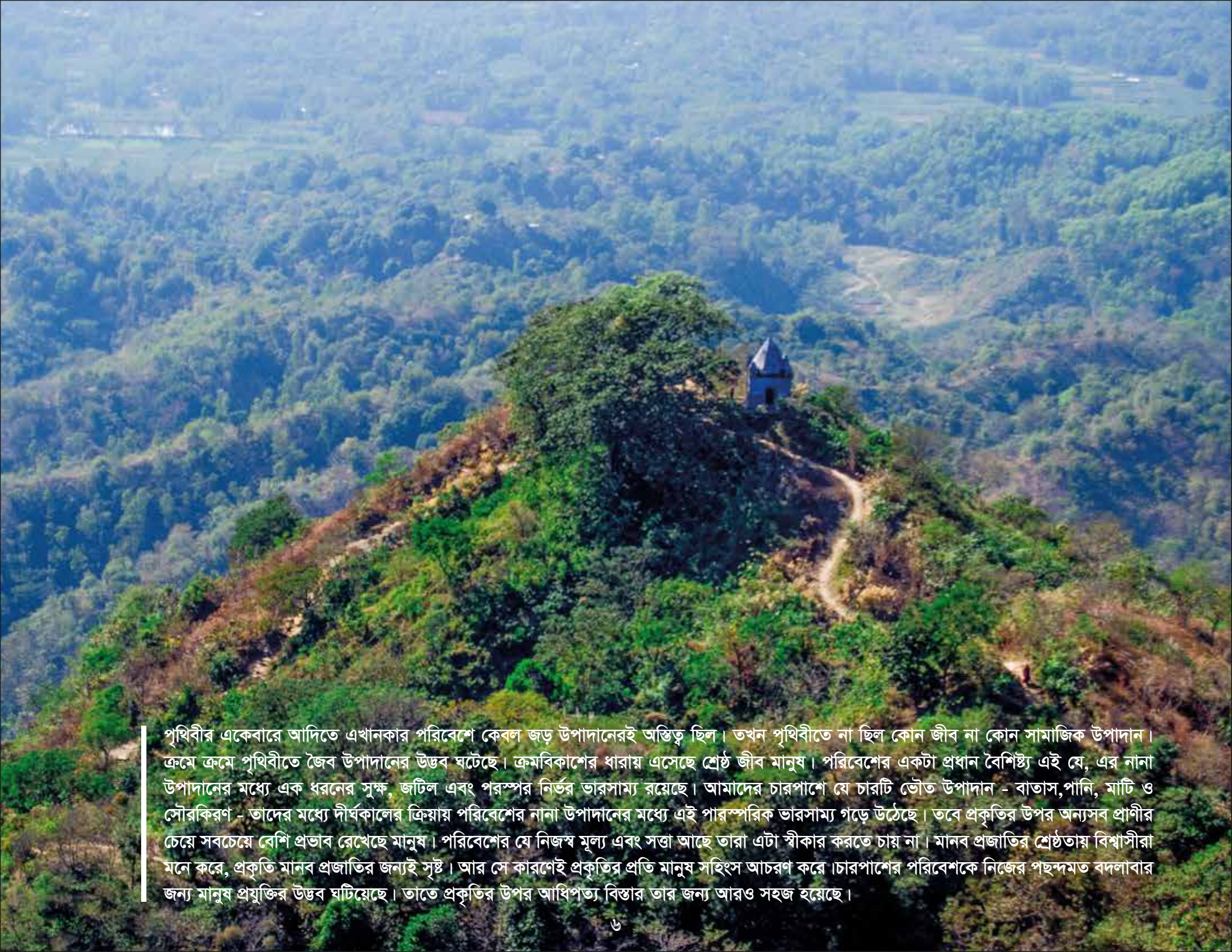
বাংলাদেশে সামগ্রিক পরিসরে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ। তাই তত্ত্ব ও প্রয়োগে কৃষিকে যথাযথভাবে অনুধাবন করা আমাদের কাজের উদ্দেশ্য। এই কাজে রিইব ভবিষ্যতে আরও ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমাদের এই কাজে রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং-এর সহযোগিতা আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে, ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করি।

শামসুল বারি
চেয়ারম্যান, রিইব

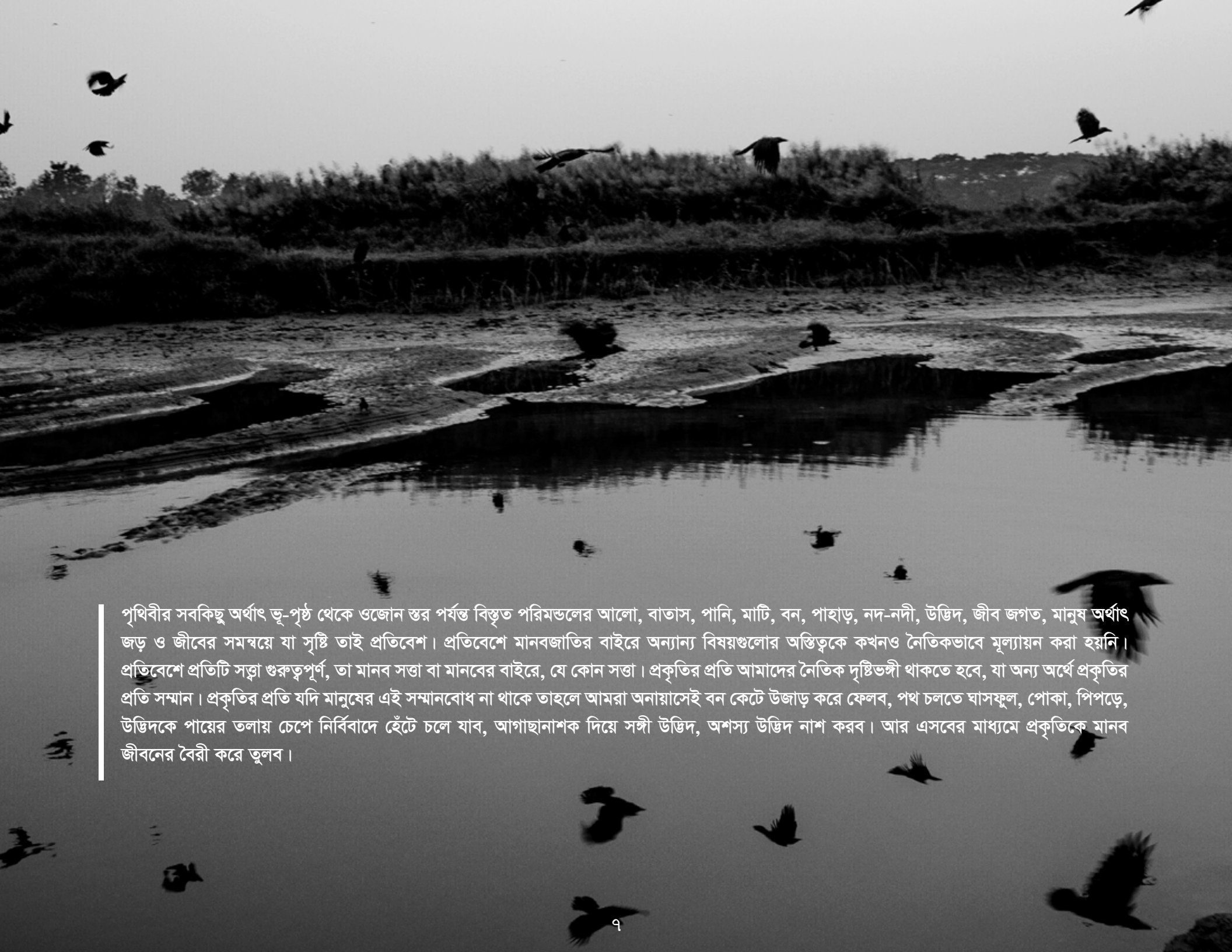
প্রতিবেশ

আমাদের পৃথিবী জৈব ও অজৈব প্রাকৃতিক উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এবং এদের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের সম্পর্ক গভীর। এই পৃথিবীতে রয়েছে এসব জীবের মধ্যকার বৈচিত্র্য ও নানান প্রজাতি। যেমন, বিভিন্ন রঙের প্রজাপতি, পাখি, বিভিন্ন স্বাদের মাছ, বিভিন্ন গাছপালা আর বিভিন্ন চেহারা, গড়নের মানুষ। এসব বিভিন্ন জীব যে পরিবেশে টিকে থাকার প্রয়োজনে প্রকৃতিতে নিজেদের মত করে আবাস গড়ে তোলে, সেটাই হচ্ছে তাদের বাস্তুসংস্থান বা প্রতিবেশ।





পৃথিবীর একেবারে আদিতে এখানকার পরিবেশে কেবল জড় উপাদানেরই অস্তিত্ব ছিল। তখন পৃথিবীতে না ছিল কোন জীব না কোন সামাজিক উপাদান। ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে জৈব উপাদানের উদ্ভব ঘটেছে। ক্রমবিকাশের ধারায় এসেছে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। পরিবেশের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এর নানা উপাদানের মধ্যে এক ধরনের সুক্ষ, জটিল এবং পরস্পর নির্ভর ভারসাম্য রয়েছে। আমাদের চারপাশে যে চারটি ভৌত উপাদান - বাতাস, পানি, মাটি ও সৌরকিরণ - তাদের মধ্যে দীর্ঘকালের ক্রিয়ায় পরিবেশের নানা উপাদানের মধ্যে এই পারস্পরিক ভারসাম্য গড়ে উঠেছে। তবে প্রকৃতির উপর অন্যসব প্রাণীর চেয়ে সবচেয়ে বেশি প্রভাব রেখেছে মানুষ। পরিবেশের যে নিজস্ব মূল্য এবং সত্তা আছে তারা এটা স্বীকার করতে চায় না। মানব প্রজাতির শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসীরা মনে করে, প্রকৃতি মানব প্রজাতির জন্যই সৃষ্ট। আর সে কারণেই প্রকৃতির প্রতি মানুষ সহিংস আচরণ করে। চারপাশের পরিবেশকে নিজের পছন্দমত বদলাবার জন্য মানুষ প্রযুক্তির উদ্ভব ঘটিয়েছে। তাতে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার তার জন্য আরও সহজ হয়েছে।



পৃথিবীর সবকিছু অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওজোন স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত পরিমন্ডলের আলো, বাতাস, পানি, মাটি, বন, পাহাড়, নদ-নদী, উদ্ভিদ, জীব জগত, মানুষ অর্থাৎ জড় ও জীবের সমন্বয়ে যা সৃষ্টি তাই প্রতিবেশ। প্রতিবেশে মানবজাতির বাইরে অন্যান্য বিষয়গুলোর অস্তিত্বকে কখনও নৈতিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। প্রতিবেশে প্রতিটি সত্তা গুরুত্বপূর্ণ, তা মানব সত্তা বা মানবের বাইরে, যে কোন সত্তা। প্রকৃতির প্রতি আমাদের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে হবে, যা অন্য অর্থে প্রকৃতির প্রতি সম্মান। প্রকৃতির প্রতি যদি মানুষের এই সম্মানবোধ না থাকে তাহলে আমরা অনায়াসেই বন কেটে উজাড় করে ফেলব, পথ চলতে ঘাসফুল, পোকা, পিপড়ে, উদ্ভিদকে পায়ের তলায় চেপে নির্বিবাদে হেঁটে চলে যাব, আগাছানাশক দিয়ে সঙ্গী উদ্ভিদ, অশস্য উদ্ভিদ নাশ করব। আর এসবের মাধ্যমে প্রকৃতিকে মানব জীবনের বৈরী করে তুলব।

কৃষি প্রতিবেশ

জীবজগতের সাথে প্রতিবেশের বিভিন্ন উপাদানের যে পারস্পরিক সম্পর্ক, তা প্রাকৃতিকভাবে বৈচিত্রময় ও ভারসাম্যপূর্ণ। যে ধরনের কৃষিকাজ এই ভারসাম্যপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশকে বজায় রাখে, প্রাকৃতিক উপাদানের মাধ্যমে উৎপাদন করে, ইকোসিস্টেমকে সুসংহত করে তাকে বলে কৃষি প্রতিবেশ। সহজ ভাষায় একে অনেকে “জৈব কৃষি” বলে।





জঙ্গলে নানা ধরনের গাছপালা একসাথে থাকে। অথচ কোন গাছেরই পুষ্টি ঘাটতি হয় না। নানা প্রজাতির ফসল একসাথে চাষ করে প্রকৃতির এই ছন্দকে কৃষিক্ষেত্রে নিয়ে আসা যায়। এজন্য জমিতে বহুবর্ষজীবী ফসলের পাশাপাশি প্রতি মৌসুমে সেই মৌসুমের ফসল যোগ করা হয়। এভাবে গণগবেষক কৃকরা তাদের কৃষিক্ষেত্রে নানা প্রজাতির ফসল ও ফসলের নানা জাতের সমাহার করে, বৈচিত্র্যময় খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করছেন। এক্ষেত্রে তারা যথাসম্ভব স্থানীয় বীজ ব্যবহার করছেন। কারণ স্থানীয় বীজ জাত করতে কোন রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। এতে খরচ বাঁচে, পরিবেশ ভাল থাকে এবং বীজের জন্য বাইরের কারও উপর নির্ভর করতে হয় না।

লোকজ ধান



পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি মানুষের প্রধান খাদ্য ধান। আদি কৃষকেরা তাদের জমির পরিবেশ উপযোগী অজস্র জাত বাছাই করেছিলেন। এসব ধানের সাথে মাছ ও অন্যান্য জলজ সম্পদ, ডাল ফসল ইত্যাদি যুক্ত করে গড়ে উঠেছিল নানা ধরনের ফসল বিন্যাস। প্রতি বছর ধানের খোসা, চাল ও পাতার রঙ ও আকৃতি, শীষ ও গাছের আকার ইত্যাদি চরিত্র পর্যবেক্ষণ করে কৃষকসমাজ বংশ পরম্পরায় এসব জাত সংরক্ষণ করতেন। এই ট্রাডিশনের সাথে নবান্ন, পৌষ পার্বণ প্রভৃতি কৃষিভিত্তিক উৎসব, স্থানীয় খাদ্যসংস্কৃতি ও লোকায়ত জ্ঞানের যোগসূত্র ছিল। ১৯৭০ সাল অবধি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এই ভূখন্ডের ১২ হাজারের অধিক লোকজ ধানের নাম নথিভুক্ত করেছিল। কিন্তু আধুনিক জাতের একক ধান চাষের প্রসারের ফলে অধিকাংশ স্থানীয় জাত কৃষকের জমি থেকে হারিয়ে গেছে। অথচ এসব জাতের পুষ্টিগুণ, সুবাস, বন্যা-খরা-লবণাক্ততা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনশীলতা, রোগ পোকা প্রতিরোধ ক্ষমতা আধুনিক রাসায়নিক সার-বিষ নির্ভর ধানের চেয়ে বেশি। আমাদের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এসব লোকজ ধান চাষ করতে কোন রাসায়নিক উপকরণ প্রয়োজন হয় না, ফলে উৎপাদন খরচ কম হয়। অন্যদিকে ধারাবাহিক উৎপাদন নিশ্চিত করে কৃষকের টেকসই খাদ্যসুরক্ষা। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে ক্ষেতের মাটি-পানি অনুযায়ী বিভিন্ন জাতের ধান পাশাপাশি চাষ করলে রোগপোকার আক্রমণ তেমন হয় না। লোকজ ধানের চাষের প্রসার এবং এসব ধানের ভাত খাওয়ার অভ্যাস করার মাধ্যমে আমরা এসব অমূল্য সম্পদ সুরক্ষিত রাখতে পারি। আমাদের কৃষকরা সে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

প্রতিবেশ নির্ভর চাষ পদ্ধতি

মিশ্র চাষ



কৃষি প্রতিবেশ রক্ষায় শস্য বৈচিত্র্য বজায় রেখে চাষ করা গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন দেশের আদি কৃষকরা শস্য বৈচিত্র্য বজায় রেখে চাষ করার নানা পদ্ধতি বের করেছিলেন। তার মধ্যে মিশ্র চাষ, সারি করে অর্থাৎ বেড পদ্ধতির চাষ, সাথী ফসল চাষ, শস্য আবর্তন, বহুতলীয় চাষ উল্লেখ্য। চাষের ক্ষেত্রে জীব, বৈচিত্র্য বাড়িয়ে তোলার জন্যে শস্যের প্রজাতির সংখ্যা বেশি রাখা প্রয়োজন।



মিশ্র চাষ এমন ফসল চাষ পদ্ধতি যেখানে দুই বা দুই এর অধিক ফসল একসাথে একই জমিতে চাষ করা হয়। এই ধরনের চাষের ফলে যেসব উপকার হয় তা হলঃ

১. মাটির পুষ্টি বজায় থাকে
২. বালাই নির্মূলে সহযোগিতা করে,
৩. জলবায়ুর পরিবর্তনগত ক্ষতিকর প্রভাবের (জলাবদ্ধতা, শুষ্কতা, অধিক তাপ, অধিক ঠান্ডা) ফলে ফসলকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে সহযোগিতা করে। এতে ফসলের সার্বিক উৎপাদন বাড়ে ও জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

বৈচিত্র্যপূর্ণ ফসলের চাষ ক্ষতিকারক পোকা মাকড়, রোগ বালাই সৃষ্টিকারী উপাদানের প্রাদুর্ভাব হ্রাস করে। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ ফসলের মাঠে খাদ্য প্রাপ্তি সহজ থাকায় বিশেষ শ্রেণির তৃণভোজীদের পাওয়া যায় ও তারা দীর্ঘ সময় অবস্থান করে। যে সমস্ত ফসলের মাঠে বৈচিত্র্যময় ফসল থাকে সেখানকার মাটির উপরে ও নীচে উপকারি জীব সমৃদ্ধ থাকে যা প্রাকৃতিকভাবে পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণ করে। রোগ সৃষ্টিকারী অনুজীবের বিকাশকে বাধা দিয়ে ফসলের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা বাড়ায়। এছাড়াও ফসলবৈচিত্র্য, ফসল আবর্তন, বিচ্ছিন্ন মাঠ, চাষহীন জমি এবং বহুবর্ষী ফসলী জমিভিত্তিক চাষ পোকার আক্রমণের গতি কমিয়ে দিতে পারে।



সারি বা বেড পদ্ধতিতে চাষঃ



এই পদ্ধতিতে একটি জমিতে সারি করে একেক সারিতে একেক ফসল চাষ করা যায়। এতে করে ফসল তুলতে সহজ হয়। ছোট খামারে কম জায়গায় একই সাথে বিভিন্ন শস্য উৎপাদন করে পরিবারের চাহিদা মেটানো যায়। তবে একই পরিবারের সদস্য ফসল পাশাপাশি না লাগানোই উত্তম।

বহুতলীয় চাষ

একই জমিতে একই সময়ে বিভিন্ন উচ্চতার বিভিন্ন ফসল চাষ করাকেই বলে বহুতলীয় চাষ। বিভিন্ন উচ্চতার গাছ থাকার ফলে সূর্যের আলোর সর্বোত্তম ব্যবহার হয়ে থাকে। যেসব গাছে কম সূর্যালোক প্রয়োজন হয়ে থাকে বড় গাছ তাদেরকে সেই সুবিধা দান করে। আর এই পদ্ধতিতে এই উদ্দেশ্য মাথায় রেখেই ফসল লাগাতে হয়।

মাটির পুষ্টি ব্যবস্থাপনা



মাটি হচ্ছে প্রতিবেশ নির্ভর কৃষির অন্যতম ভিত্তি। মাটি হলো ভূপৃষ্ঠের উপরিতলের নরম খনিজ এবং জৈব উপাদানের মিশ্রণ যা উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। উপযুক্ত মাটি না হলে অর্থাৎ ফসলের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান সমৃদ্ধ মাটি না হলে কাক্ষিত ফসল পাওয়া যায় না। রাসায়নিক উপকরণ প্রয়োগের ফলে নিষ্প্রাণ হয়ে যাওয়া মাটিতে জৈব কম্পোস্ট সার ও তরল সার ব্যবহার করে উর্বরতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।



উদ্ভিদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্য যে খাদ্যবস্তুগুলোর প্রয়োজন তার মধ্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম প্রধান। এদেরকে মুখ্য পুষ্টি উপাদান বলে। এছাড়া বিভিন্ন মৌল যেমনঃ ম্যাগ্নানিজ, তামা, বোরন, দস্তা, ক্যালসিয়াম, সালফার ইত্যাদি গৌণ পুষ্টি উপাদানও উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। এই পুষ্টি উপাদানগুলো মাটিতে জটিল যৌগ হিসেবে উপস্থিত থাকে। এদের উদ্ভিদের শেকড়ের শোষণের উপযোগী করে তুলতে অজস্র জীবের উপস্থিতি অবশ্যই প্রয়োজন। কেঁচো, কেন্নো, সিউডোস্করপিয়ন, গুবরে পোকা ও তাদের শুককীট ও বিভিন্ন অনুজীব মাটির মধ্যকার বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ পদার্থ ও জটিল অদ্রব্য রাসায়নিক যৌগকে ভেঙে উদ্ভিদের খাদ্য তৈরি করে দেয়। সুতরাং যে মাটিতে এসব জীব-অনুজীব নেই সেই মাটি অনুর্বর হয়ে পড়ে।

জাবড়া

প্রকৃতিতে সুলভ শুকনো ঘাস, পাতা, খড়, বিচালী দিয়ে মাটি ঢেকে এবং পানির আর্দ্রতা ধরে রেখে ফসল ফলানোর পদ্ধতি। বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে ক্ষেতে জাবড়া ব্যবহার করলে সেচ কম লাগবে, জমির আর্দ্রতা থাকে, সময়, শ্রম বাঁচায় এবং জমির উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে। অনেকে প্লাস্টিকের সিট জাবড়া হিসেবে ব্যবহার করে, যা প্রকৃতি বিরুদ্ধ, কারণ এর ফলে মাটিতে থাকা অনেক অনুজীব মারা যায়।



পানি এ গ্রহের সকল জীবনের জন্য একটি অপরিহার্য সম্পদ। পৃথিবীর সকল পানি সম্পদের মধ্যে কেবলমাত্র ২.৫ শতাংশ পানি বিশুদ্ধ। পরিষ্কার, নিরাপদ ও সুপেয় পানির প্রাপ্যতা দিন দিন সীমিত হচ্ছে। কারণ কৃষিকাজে মাটির সঙ্গে পানির সম্পর্ক নিবিড়। ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষি সেচের কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ পানির উপর চাপ বেড়েছে।

আর বর্তমান এবং ভবিষ্যতে মানুষের চাহিদা মেটাতে পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক সম্পদ বিশুদ্ধ পানির পরিমাণ বজায় রাখতে পানি ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রতিবেশ সহায়ক চাষ



শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে কৃষিতে চাষাবাদের উপকরণে প্রযুক্তির প্রাধান্য ক্রমবর্ধমান। এর ফলে আমাদের দেশজ উপকরণের বিলুপ্তি ঘটে চলেছে। অথচ এসব উপকরণ আমাদের অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের ধারক। প্রযুক্তির পাশাপাশি এসবের প্রচলন থাকা জরুরী কৃষির সুস্থায়িত্বের জন্যে।

কৃষি প্রতিবেশে পোকামাকড়



জৈবিক চাষে ব্যাঙ, চিল, পেঁচা, গুইসাপ, মাকড়সা, লেডী বার্ড বিটল, ক্যারাবিড বিটল, বোলতা, মিরিড বাগ, ওয়াটার বাগ, ড্যামসেল ফড়িং প্রভৃতি উপকারী পোকামাকড় ও অন্যান্য প্রাণী ক্ষতিকারক পোকা দমনে যথেষ্ট সাহায্য করে। চাষীরা এদেরকে বন্ধু পোকা বলে থাকে।





পাখিরা প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষি জমিতে পোকামাকড় ও ক্ষতিকর জীবাণু খায়, ফলে ফসলের ক্ষতি রোধ করে। পাখির বিষ্ঠা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। পরাগায়নের মাধ্যমে গাছপালা ও ফুলের বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এছাড়াও, পাখিরা আমাদের পরিবেশকে সুন্দর ও মনোরম করে তোলে।

দুঃখজনকভাবে, দ্রুত শহরায়নের ফলে পরিবেশবান্ধব পাখিরা হারিয়ে যেতে বসেছে। কৃষিক্ষেত্রে অতিরিক্ত কীটনাশক ও কারেন্ট জালের ব্যবহার কৃষিবান্ধব পাখির মৃত্যুর প্রধান কারণ। জলবায়ু পরিবর্তন এবং বনজঙ্গল ধ্বংসের ফলেও পাখিদের আবাসস্থল হ্রাস পাচ্ছে।



আত্ম-উন্নয়নে গণগবেষণা



পার্টিসিপেটরি একশন রিসার্চ বা গণগবেষণার একটি মৌলিক ধারণা হল চিন্তাশক্তি ও জ্ঞানের দিক দিয়ে কোন শ্রেণীই কোন শ্রেণীর চাইতে ‘অগ্রসর’ নয়। তবে দৈনন্দিন সংগ্রামের কারণে কারও চিন্তা করার অবকাশ বেশী কারও কম। এতে তাদের চিন্তাশক্তি ক্ষয়ে যায় না, নিষ্ক্রিয় থাকে। গণগবেষণায় যৌথ অনুসন্ধান গুরুত্বপূর্ণ। যৌথভাবে আলোচনা, চিন্তা ও কাজের মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হওয়া যায় এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। এভাবে ক্রমাগত চিন্তা, জ্ঞানচর্চা ও কাজের মাধ্যমে গণগবেষকদের চিন্তাশক্তি শাণিত হয় এবং তারা আত্মনির্ভরশীলতা ও ক্ষমতায়নের দিকে এগিয়ে যান। কৃষি প্রতিবেশের সমস্যা সমাধানে যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।



চিত্তা



গণগবেষণার একটি প্রধান লক্ষ্য সাধারণ মানুষের নিষ্ক্রিয় চিন্তাশক্তিকে শাণিত করা। যাতে তারা নিজেদের মত করে যৌথভাবে সমস্যা বিশ্লেষণ করে নিজেদের জ্ঞান উন্নত করে সেই জ্ঞানের আলোকে একশন বা কাজ শুরু করেন। যা কিনা শ্রমজীবীদের নিজস্ব প্রাক্সিস নামে পরিচিত। কৃষকরা প্রতিবেশ নির্ভর কৃষি করার ক্ষেত্রে যা প্রয়োগ করেছে। তারা নিজেদের সমস্যাকে চিহ্নিত করেছে, সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করে একশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করেছে। যা তাদের আত্ম-উন্নয়নে সহায়তা করেছে এবং তারা প্রতিবেশ নির্ভর কৃষি বাস্তবায়ন করেছে।

এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত বগুড়া ও সাতক্ষীরার কৃষকরা গণগবেষণার মাধ্যমে তাদের কৃষিজ, পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেছিলেন। এসব সমস্যা সমাধানে কৃষকরা আয় বাড়ানোর জন্য কৃষি উৎপাদন খরচ কমানোর বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন, কারণ কৃষি উপকরণের দাম বা বাজারে ফসলের দামের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। এছাড়া তারা পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে বিষমুক্ত খাদ্য উৎপাদনের কথাও ভাবতে থাকেন। এই অনুসন্ধানে প্রবীণ কৃষকদের ছোটকালের স্মৃতি তাদের মনে করিয়ে দেয় যে, একসময় গ্রামে বিষাক্ত ও ব্যয়বহুল রাসায়নিক কৃষি উপকরণ ছাড়াই সকল আবাদ হত। এর পাশাপাশি দলীয় এনিমেটররা তাদেরকে প্রতিবেশ নির্ভর কৃষির পদ্ধতিগুলোর বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন। এর ফলে গণগবেষণার একশন হিসেবে কৃষকরা স্থানীয় যুবদের সাথে মিলে স্থানীয় কৃষি-প্রতিবেশ সুরক্ষা এবং সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।



একশন

এনিমেটরের ভূমিকা



যে শক্তি জনগণের মনে উদ্যোগের প্রণোদনা তৈরী করতে পারে, গণ-গবেষণায় সেই শক্তি হচ্ছে এনিমেটর বা উজ্জীবক। যারা জনগণকে পথ দেখাতে সক্ষম হন কি করে নিজেরা সংগঠিত হয়ে এবং যৌথ উদ্যোগ নিয়ে সামনে এগোনো যায়। এনিমেটর অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃস্থ উভয়ই হতে পারে। একজন এনিমেটরের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের ভিত্তি হবে এভাবে যে, জনগণই নিজেদের যৌথ উদ্যোগ দ্বারা নিজেদের সমস্যাবলীর সমাধানের পথে এগোবেন এবং এই প্রচেষ্টায় এনিমেটর সহায়ক হতে পারেন, সাহায্যদাতা নন।

গণগবেষণা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এনিমেটর বা উজ্জীবকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে দল গঠন, আলোচনা সঞ্চালনা, প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং নেটওয়ার্কিং-এর ক্ষেত্রে এনিমেটরকে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে হয়। এনিমেটর যদি জনগোষ্ঠীর ভেতর থেকে হয় তাহলে তাকে ইন্টারনাল বা অন্তঃস্থ এনিমেটর এবং বাইরে থেকে গেলে এক্সটারনাল বা বহিঃস্থ এনিমেটর বলা হয়। বহিঃস্থ এনিমেটরদের অন্যতম লক্ষ্য থাকে যত বেশি সম্ভব অন্তঃস্থ এনিমেটর তৈরি করা, যাতে তারা স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যা সমাধান এবং সমাজ পরিবর্তনে জনগোষ্ঠীকে উজ্জীবিত করতে ভূমিকা রাখতে পারেন।



বীজ ও বালাই ব্যবস্থাপনা

প্রতিবেশ নির্ভর কৃষি প্রকৃতি নির্ভর এবং ফসলের প্রজাতিগুলোও নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। স্থানীয় জাতের ফসলের উৎপাদনও সেই নির্দিষ্ট স্থানের উপর নির্ভর করে। যেহেতু এই কৃষিতে প্রাকৃতিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাই এখানে স্থানীয় প্রজাতির ফসলের আবাদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্থানীয় জাতের উদ্ভিদ রাসায়নিক সার ও বালাইনাশক নির্ভর নয়। মাটি এবং প্রকৃতির স্থানীয় গুণাগুণের উপরই নির্ভর করে।





মানসম্মত ফসলের বীজ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোম্পানী নির্ভর না হয়ে স্বনির্ভরতার জন্যও স্থানীয় জাতের ফসলের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। কারণ খাদ্যে সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে হলে আগে দরকার বীজে সার্বভৌমত্ব অর্জন, কেননা বীজই হচ্ছে বিশ্ব খাদ্য ব্যবস্থার ভিত্তি। তাই প্রতিবেশ নির্ভর কৃষিতে স্থানীয় প্রজাতির ফসল আবাদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি, কারণ এর মধ্য দিয়ে বীজের উপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ আসে।



বরবাটি



বথুয়া



লাল শাক



চাল কুমড়া



খিরাই



ডাটা শাক



বিজ্জা



বাজী



মটরগুটি



করলা



কলমি



মটর

জৈব সার



জৈব সার পশুপ্রাণীর বর্জ্য এবং উদ্ভিদ বস্তু থেকে প্রাকৃতিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়। এই ধরনের সার-এর মধ্যে উদ্ভিদের জন্য অপরিহার্য ১৬ রকমের পুষ্টি থাকে। যা মাটির সংস্পর্শে এসে উষ্ণতা ও আর্দ্রতার সঙ্গে মিশে পচন প্রক্রিয়া শুরু হয়। যেখানে বিভিন্ন অণুজীব ভূমিকা পালন করে। এভাবে প্রাণী ও উদ্ভিদ বর্জ্য সারে পরিণত হয়। জৈব সারের উৎস হচ্ছে খামারজাত সার, কম্পোস্ট সার, আবর্জনা সার, কেঁচো সার, উদ্ভিদ ও জৈব উৎস থেকে পাওয়া অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ। হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, শুকনো রক্ত, হাঁড়ের গুড়ো, সবুজ সার, অ্যাজোলা এবং ছাই থেকেও এসব পুষ্টি পাওয়া যায়। যখন জমিতে সার দেওয়া হয়, তখন তা গাছকে না মাটিকে দেওয়া হয়। সারের কাজ হচ্ছে জমিতে আগে যে ফসল হয়ে গেছে এবং সেই ফসল মাটির যেসব রাসায়নিক উপাদান নিয়ে নিয়েছে তাকে প্রতিস্থাপন করা।

বালাই ব্যবস্থাপনা



ফসলের বালাই বলতে সেসব জীব ও অনুজীবকে বোঝায় যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ফসলের ক্ষতি করে। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে তার প্রায় ৭৫ শতাংশ হলো পোকামাকড়। এদের মধ্যে বেশ কিছু পোকা মানুষ ও ফসলের জন্য ক্ষতিকর। ফসলের ক্ষতিকর আর একটি বালাই হলো রোগ। বিভিন্ন ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, কৃমি, জীবাণু ফসলের রোগ সৃষ্টি করে। এসব বালাই রোধে জৈব উপায়ে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে : ১. অশস্য উদ্ভিদ রোপণ। বেশ কিছু অশস্য উদ্ভিদ যেমন, আকন্দ, রামতুলসী ও বনতুলসীর গন্ধ শস্যের অনেক শত্রু পোকা তাড়িয়ে দেয়। ২. উদ্ভিদের নির্যাস ব্যবহার : উদ্ভিদের পাতা, কাণ্ড ও ফল ইত্যাদির নির্যাস ব্যবহার করে ফসলের পোকা ও রোগ দমন করা যায়। ৩. উদ্ভিদের প্রজাতি-জাত বৈচিত্র্যতা বৃদ্ধি। ৪. প্রাণীদের বৈচিত্র্য বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের শত্রু পোকা দমন: মাকড়সা, ফড়িং, ঘুরঘুরে পোকা, ম্যান্টিস পোকা, ব্যাঙ, টিকটিকি, গিরগিটি, সাপ, শালিক, ফিঙে, দোয়েল, বাবুই, পেঁচা ইত্যাদি অজস্র প্রাণী ফসলের শত্রু পোকাদের খেয়ে নিয়ন্ত্রণ করে। ৫. ধানক্ষেতে পার্সিং ব্যবহার। ধানের জমিতে বাঁশ বা ডাল-পালা পুঁতে এবং লাইফ পাচিং অর্থাৎ জমিতে বিশেষ দূরত্বে ধইধগ গাছ লাগিয়ে পাখি বসার ব্যবস্থা করলে কীটনাশক ছাড়াই ফসলের পোকামাকড় দমন করা যায়।

কৃষিতে অশস্য উদ্ভিদ

কৃষিক্ষেত্রে অশস্য উদ্ভিদ বপন ছাড়াই জন্মায়। মানুষ সাধারণত এসব উদ্ভিদকে ‘আগাছা’ নামে অভিহিত করে থাকে। সকল অশস্য উদ্ভিদই স্বভোজী অর্থাৎ সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেদের খাদ্য জোগাড় করে তবে কিছু পরজীবীও আছে। রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার না করলে কৃষিক্ষেত্রে ও আশেপাশে প্রাকৃতিকভাবেই নানা ধরনের অচাষকৃত উদ্ভিদ বা ছত্রাক জন্মে। এসব অশস্য উদ্ভিদকে অব্যঞ্জিত আগাছা হিসেবে বিবেচনা করা হলেও এর রয়েছে অনেক গুণ। এসব অশস্য শাক সবজি, ঔষধ, পশুখাদ্য, জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং জমির জৈব পদার্থ আবর্তনে ব্যবহৃত হয়। প্রতিবেশ নির্ভর কৃষি নিয়ে যেসব বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন তারা দেখিয়েছেন যে, কিছু কিছু অশস্য উদ্ভিদ ফসলের ক্ষেতকে পোকাকার আক্রমণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেও সাহায্য করে। দুই ফসল মৌসুমের মাঝখানের ত্রাণ্তিকালে এসব পুষ্টিকর উদ্ভিদ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য যোগায়।



নানা ধরনের অশস্য ও ঔষধি উদ্ভিদ থাকলে কৃষিক্ষেতের বৈচিত্র্য বাড়ে, পোকাকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা পায় এবং পরাগসংযোগকারী পতঙ্গ আকৃষ্ট হয়। এছাড়া এসব ঝোপঝাড়ে নানা উপকারী পোকা ও প্রাণী বংশবৃদ্ধি করে। গণগবেষক কৃষকরা এসব উদ্ভিদ টিকিয়ে রাখার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। বর্তমানে মনোকালচার চাষের কারণে কৃষক নির্দিষ্ট ফসল ছাড়া বাকি সবকিছু আগাছা মনে করে এবং বিনাশ করে। এখন কৃষক আগাছানাশক বিষ ব্যবহার করে। এর ফলে যা হয়, ঐ ক্ষেতে সকল উপকারী অশস্য উদ্ভিদের প্রজাতি বিনষ্ট হয়ে বিলুপ্তির পথে চলে যায়, অণুজীব ধ্বংস হয়, উৎপাদিত পণ্য বিষাক্ত হয়, যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

উপকারী উদ্ভিদ



কিছু কিছু অশস্য উদ্ভিদ মানুষ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এসব উদ্ভিদ গ্রামের ঝোপঝাড়, ডোবা পুকুর পাড়ে জন্মায়। আমরুল শাক, থানকুনি পাতা, শুশুনী শাক, বথুয়া শাক, কাটানটে, ডেমি শাক, শাটী শাক খাদ্য হিসেবে যেমন খাওয়া যায়, একই সাথে এসবের ওষধি গুণও আছে।



আগে গ্রামাঞ্চলের কবিরাজ শারিরীক বিভিন্ন চিকিৎসায় এইসব অশস্য উদ্ভিদের ব্যবহার করতেন এবং এখনও অনেকে করে যাচ্ছেন। এটি একটি বিশেষ জ্ঞান এবং এই জ্ঞান বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ যাকে আমরা আগাছা বলছি সেইসব অশস্য উদ্ভিদের ভেষজ গুণ রয়েছে। যেমন জবাফুল গাছ। এর ভেষজগুণ গ্রামাঞ্চলের সকলেই জানেন। এমনকি জবা ফুল শস্য ক্ষেতের মাঝখানে থাকলে পোকার আক্রমণকে প্রতিহত করে থাকে। তাই প্রতিবেশ টিকিয়ে রাখতে হলে প্রতিবেশ নির্ভর কৃষিই করতে হবে। অন্যপক্ষে ভোজ্য তৈরি করতে হবে, ভোজ্যদেরও সচেতন হতে হবে। কারণ ভোজ্য চাহিদা না থাকলে কৃষক তার ক্ষেতে সেই শস্য রাখবে না।



উপকারী জলজ উদ্ভিদ



আমাদের দেশের নদ-নদী, খাল-বিলে প্রচুর পরিমাণ জলজ উদ্ভিদ দেখা যায় যা প্রতিবেশকে সুস্থায়ী করতে সহায়তা করে, চাষবাসের জন্যে এবং মানব খাদ্যে যা ভূমিকা রেখে থাকে। যেমন শাপলা, শালুক মানুষের খাদ্য এবং জৈব সার হয়। ক্ষুদিপানা পানিতে ভারী ধাতুগুলো শোষণ করে উপকার করে। কচুরিপানা ব্রাজিলের উদ্ভিদ হলেও তা এখন আমাদের দেশে পরিচিত এবং জৈব সার তৈরি করতে সহায়ক। ধানক্ষেতে ‘আজোলা’ নামের জলজ উদ্ভিদ বাতাস থেকে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে, যা কিনা মাটি ও পানির উর্বরতা বাড়ায় এবং এতে ধান উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

উদ্যোক্তা ও বাজারজাতকরণ

ফসল আবাদ উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। আমাদের দেশে সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ বা বিপণন ব্যবস্থা গড়ে না উঠায় উৎপাদকগণ প্রায়শই পণ্যের প্রকৃত মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন।



১। কুড়িয়ে পাওয়া শাক-সবজি।
২। জৈব উপায়ে চাষ করা ফসল।
৩। স্থানীয় জাতের বিষমুক্ত ফল বিক্রয় করা হয়।
৪। জৈব সার ও জৈব বালাই প্রতিরোধক।

সার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব)
সিআলএস ট্রাষ্ট (আর এল এস)

Supported by:
ROSA LUKSEMBURG
STIFTUNG
SOUTH ASIA





নিরাপদ খাদ্য, স্থানীয় বাজার ও গণগবেষক কৃষকদের উদ্যোগ : বগুড়া ও সাতক্ষীরা জেলার গণগবেষক কৃষকরা স্থানীয় কৃষি অফিস ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নিরাপদ ফসল ও খাদ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রির একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রথমে কিছু সমস্যা হলেও, গণগবেষক কৃষকদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ধীরে ধীরে ভোক্তাদের একাত্ম সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং কৃষকদের সাথে ভোক্তাদের আস্থার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।



ঢাকায় অনুষ্ঠিত উদ্যোক্তা ক্যাম্পের মাধ্যমে কৃষকরা নিজস্ব বিপণন কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন, যার ফলে সচেতন ভোক্তারা এখন রাসায়নিক সার, বিষ ও হরমোন দিয়ে উৎপাদিত চকচকে ফসলের অন্ধকার দিক বুঝতে পারছেন। স্থানীয় বাজারগুলোতে কৃষকরা সরাসরি নিজেদের খাদ্য বিপণন কেন্দ্রগুলোতে বিষমুক্ত ফসল সরবরাহ করছেন, যা তারা স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করছেন।

এই উদ্যোগের ফলে:

- ভোক্তারা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করতে পারছেন।
- কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন।
- স্থানীয় কৃষি অর্থনীতির উন্নয়ন হচ্ছে।
- রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমছে, যা পরিবেশের জন্য ভালো।



কৃষিতে নারী

মানুষ এবং সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং তা উন্নততর হয়ে থাকে পারস্পরিক ন্যায্যতার আচরণের মধ্যে দিয়ে। সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সমাজে বসবাসকারী সকলের সমান সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির পরিবেশ থাকতে হবে, চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা থাকতে হবে। এখানে জেভার ন্যায্যতার প্রসঙ্গ এসে যায়। সমাজে নারী-পুরুষ-অন্য লিঙ্গের মানুষের প্রতি সুবিধার, সমতা ও ন্যায্যতা বিধানের প্রক্রিয়া জেভার ন্যায্যতার মূল দিক। সমাজের সব সদস্যের প্রতি সমদর্শী আচরণ করে এমন প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে অপ্রতুল, যা জেভার অসমতা তৈরি করে। প্রাতিষ্ঠানিক এবং মানুষের চিন্তা, মূল্যবোধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভেতরের বাধাগুলোকে বিবেচনায় এনে সবাই যাতে সমান সুযোগ ও সুফল পেতে পারে, তার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করাই জেভার ন্যায্যতার মূল লক্ষ্য। সকলের প্রতি সমান ও ন্যায্য আচরণ করা ও সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং অংশগ্রহণের সুযোগ দিলেই সমাজে জেভার ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।





কৃষিতে নারীর কাজ



বছরের ছয়মাস বা তার বেশি সময় যাদের কর্মসংস্থান থাকে তাদেরকেই শ্রমশক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শ্রমশক্তি জরিপ মতে দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬২ ভাগ এখনও কৃষিকাজ নির্ভর এবং এর মধ্যে প্রায় ৪১ ভাগ নারী।



বেশিরভাগ নারী কৃষক এই নিরবিচ্ছিন্ন সময় দৃশ্যমান কৃষিকাজে নিয়োজন করেন না বলে তারা কৃষক হিসেবে স্বীকৃত নয়। নারীর কাজের স্বীকৃতি নেই বলে এই অদৃশ্যমানতা এবং অবমূল্যায়ন। যদি কৃষিতে নারীর কাজের মূল্যায়ণ করা যেত তাহলে জিডিপিতে নারীর অবদান ১৯ ভাগের পরিবর্তে প্রায় ৮৭ ভাগ হত। নারীবাদী স্কলাররা মনে করেন যে, বিশ্বায়ন ও নয়া উদারতাবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে নারীরা নিম্ন মর্যাদা, কম মজুরী এবং পার্ট টাইম কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। যা কৃষিতে নারীর কাজের অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছে এবং সমাজে তাদেরকে অধস্তন করেছে।



রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ আয়োজিত নারী কৃষকদের একটি জেভার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে কৃষক নারীরা তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কৃষিতে নারীর ৪৩ ধরনের কাজের একটি তালিকা করেছিলেন। এই তালিকা এটাই প্রমাণ করে যে, নারী কৃষক সমাজ তাদের প্রতিদিনের এবং যাপিত সারাজীবনের কতটা সময় ব্যয় করে থাকেন এই উৎপাদনমূলক কাজে। এই তালিকাতে বর্ণিত কিছু কাজ নারীরা এককভাবে করে, বাকিটা নারী পুরুষ যৌথভাবে করে থাকেন।



কৃষিতে নারীর কাজের তালিকা:

১. আইলের ধার কাটা বা আইল ছাটা, ২. জমি পঙ্কত করা, ৩. বিভিন্ন রকম সার তৈরী করা, ৪. ঘাস কাটা, ৫. মাথায় করে মাঠ থেকে ধান নিয়ে আসা, ৬. গর্তে প্রতিদিন গোবর, ছাই ফেলা, ৭. ধানের চারা তোলা, ৮. খড়ের পালা দেওয়া ৯. জমিতে সবজি চারা লাগানো ১০. শাক তুলে বাছাই করা ১১. ঘাস বাছা ১২. গোবর জমিতে ফেলা ১৩. দেশি হাঁস মুরগি পালন ১৪. বালাইনাশক তৈরি ১৫. ধান কাটা (মজুরি শ্রমিক) ১৬. খড় কাটা গরুর খাদ্যের জন্য ১৭. ধানক্ষেতে নিড়ানি দেওয়া ১৮. বিপণনে সবজি সাজানো





১৯. পাট কাটা, পুকুরের পানিতে জাগ দেওয়া, পাট ধোওয়া, পাট শুকানো, আঁটি বাঁধা ২০. বীজ বাছাই ও সংরক্ষণ ২১. ধান সিদ্ধ করা, ২২. ভুট্টার দানা ছিলানো, বস্তায় বাঁধা ২৩. মই দেওয়া ২৪. ধান মাড়াই করা



২৫. জমিতে পানি দেওয়া, মটর চালানো ২৬. গরুর দুধ দোহন এবং বিক্রি করা ২৭. জমি নিড়ানি দেওয়া ২৮. টেকিতে চাল/চালের আটা তৈরী করা, ২৯. ধান কেটে বাঁধা ৩০. ক্ষেতের বেড়া বাঁধা ৩১. ফলমূলের গাছ লাগানো ৩২. সবজি/ ফসল তোলা



৩৩. জাংলা/মাচা দেওয়া ৩৪. ক্ষেতে পার্শিং করা, ৩৫. গোবরের ঘুটে তৈরি করা ৩৬. বাশের ঝাড়ু তৈরি ৩৭. মাঠে ভাত দেওয়া ৩৮. গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী লালন পালন করা ৩৯. ছিপ বা কোল দিয়ে মাছ ধরা, ৪০. ধানের খড় শুকানো, ৪১. ধান ভিজিয়ে জালা তৈরি করা ৪২. ঘরে কিংবা জমিতে পাইকারী ব্যবসায়ীদের কাছে ফসল বিক্রি করা



৪৩. ধান, চাল বাড়া

তৈরি ও জৈব সার প্রসারণে নারীর ভূমিকা





জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ এই কৃষি শুধু পরিবেশকেই ভাল রাখে না, সাথে সাথে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে অবদান রাখে। সবুজ বিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে জৈব কৃষির প্রসারতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর জৈব কৃষির অন্যতম উপাদান জৈব সার তৈরি করা।



রাসায়নিক সার দিয়ে মাটি নষ্ট করলে কৃষিকাজ করতে হবে রাসায়নিক দিয়ে, যা জীবন বিধ্বংসী। জৈবসার প্রাপ্তপাখির বর্জ্য এবং উদ্ভিদ বস্তু থেকে প্রাকৃতিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়। জৈব সারের উৎস হচ্ছে কম্পোস্ট সার, আবর্জনা সার, গরুর মল-মূত্র, কেঁচো সার ইত্যাদি। এছাড়াও উদ্ভিদ ও জৈব উৎস থেকে পাওয়া অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ, যেমন হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, রক্ত, হাড়ের গুড়া, সবুজ সার, এ্যাজোলা এবং ছাই। লোকজ উদ্ভিদের জন্য এসব থেকে পুষ্টি পাওয়া যায়। গ্রামাঞ্চলে এসবই সাধারণত: কৃষকের ঘরকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়। আর ঘরের এইসব কাজে নারীরাই প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে।

মজুরী বৈষম্য





নারী ও পুরুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের একটা ফর্ম হচ্ছে মজুরী বৈষম্য। যদিও নারীরা তাদের আয়ের অধিকাংশ ব্যয় করে থাকে ঘরের যাবতীয় চাহিদা পূরণে, পুষ্টি সংযোজনে অথচ তাদের মজুরী উল্লেখযোগ্যভাবে পুরুষের তুলনায় কম। এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে কৃষক হিসেবে নারীকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। অথচ নারী কৃষির প্রায় সবক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। কৃষিতে নারীর বেশিরভাগ কাজকে সহায়ক বা অনুৎপাদক হিসেবে ধরা হয়। নারীর শ্রমকে মূল্যায়ন করা হয় না বলে মজুরীর ক্ষেত্রে তার প্রভাব দেখা যায়। ২০২২ এর পরিসংখ্যান দেখায় যে, সমগ্র বাংলাদেশে সারা বছর ধরেই নারী পুরুষ মজুরী বৈষম্য বিদ্যমান থাকে। অথচ এফএও-এর হিসাবমতে এশিয়ার প্রায় অধিকাংশ দেশে সমগ্র অর্থনীতিতে বিশেষ করে কৃষিতে নারীর অবদান অনেক বেশি।





আসমা আজার, চন্দ্রীমা মন্ডল, পুষ্পা মন্ডল ও তার ভাই কাজল মন্ডল বিভিন্ন মানুষের ধান ক্ষেতে মজুরির ভিত্তিতে কাজ করে। তারা সকালে কাজ শুরু করে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পর্যন্ত কাজ করে মাঝখানে দুইবার বিরতি সহ। তারা সবাই একই পরিমাণ কাজ করে কিন্তু ৩ জন নারীই কাজল মন্ডলের চেয়ে কম মজুরি পায়। জিজ্ঞেস করা হলে পুষ্পা মন্ডল বলেন তারা পান ২৫০ টাকা করে আর কাজল মন্ডল পায় ৩৫০ টাকা করে। তারা বলেন, তারা নারী তাই তাদেরকে কম মজুরি দেয়া হয়। তারা যে পরিমাণ পরিশ্রমই করুকনা কেনো তাদের মজুরি ঠিক হয়ে যায় লৈঙ্গিক পরিচয় দেখে, পরিশ্রমের পরিমাণ দেখে নয়।

নারীর আয়বর্ধক কাজ





শ্রমবাজারে নারীর কাজ স্বীকৃতি পাবার জন্য অর্থনৈতিক মূল্যায়ন জরুরী। সেক্ষেত্রে নারীরা গৃহের আঙিনায় যেসব পণ্য উৎপাদন করে থাকেন তার বাজারজাতকরণের মাধ্যমে এই মূল্যায়ণ সম্ভব। আবহমান কাল ধরে নারী প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যে ঘর-সংসারের বিভিন্ন দ্রব্য তৈরি করে থাকে। তার মধ্যে বেতের ঝাড়ি, পাটি, পাখা, কুলা, ঝাড় উল্লেখযোগ্য। কৃত্রিম উপকরণ এসব দেশজ উপকরণকে গ্রাস করছে। পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে জৈব উপাদানে তৈরি জিনিস আরও বেশি ব্যবহার করতে হবে। এতে পরিবেশ যেমন সুরক্ষিত থাকবে তেমনি নারীর আয়বর্ধক কাজের পরিসর বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও লোকজ জ্ঞান ঐতিহ্যকে ধরে রেখে বহমান থাকবে।

নদী ও চর এলাকার কৃষিতে নারী





বলা হয়ে থাকে নারীর হাত ধরেই কৃষির সূচনা আর সভ্যতার বিকাশ সাধিত হয়েছে নদীকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশ নদী বিধৌত দেশ এবং পলিমাটির দেশ। বর্ষায় নদীর নাব্যতা কমে এলে চর জেগে উঠে। উর্বর এই চরাঞ্চলের কৃষিজাত ফসল আমাদের খাদ্যচাহিদা পূরণে বড় ভূমিকা রাখে। নদী এবং চরের এই কৃষিকাজে নারী-পুরুষ যৌথভাবে পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করে। চরের জীবনযাপন সমভূমির জীবন যাপনের তুলনায় প্রচণ্ড কঠিন এবং পরিশ্রমলব্ধ। সেখানে নারী-পুরুষ উভয়েই প্রচণ্ড পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করতে হয়। অথচ এখানেও মজুরী বৈষম্য, নারীর কাজের অদৃশ্যমানতা, অবমূল্যায়ণ এবং অসুস্থতা প্রবলভাবে বিরাজমান। যা আমাদেরকে গভীরভাবে ভাবতে অনুপ্রাণিত করে।



কৃষি প্রতিবেশ ও যুবসমাজ



বর্তমান বাংলাদেশে যুব সমাজ এক বিপুল সম্ভাবনার শক্তি, যারা প্রযুক্তির বিকাশের সাথে পরিচিত হয়ে বড় হয়েছে। বর্তমান যুব সমাজ মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। এই যুব শক্তির সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হতে পারে। রিইব জনগণকে উজ্জীবিত করে তাদের নিজেদের সমস্যা চিহ্নিত করতে ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাধান করতে। আর এক্ষেত্রে যুব সমাজ হচ্ছে পরিবর্তনের এজেন্ট এবং তাদের মাধ্যমেই সমাজে রূপান্তর ঘটবে এবং টেকসই তিবেশ নিশ্চিত হবে।

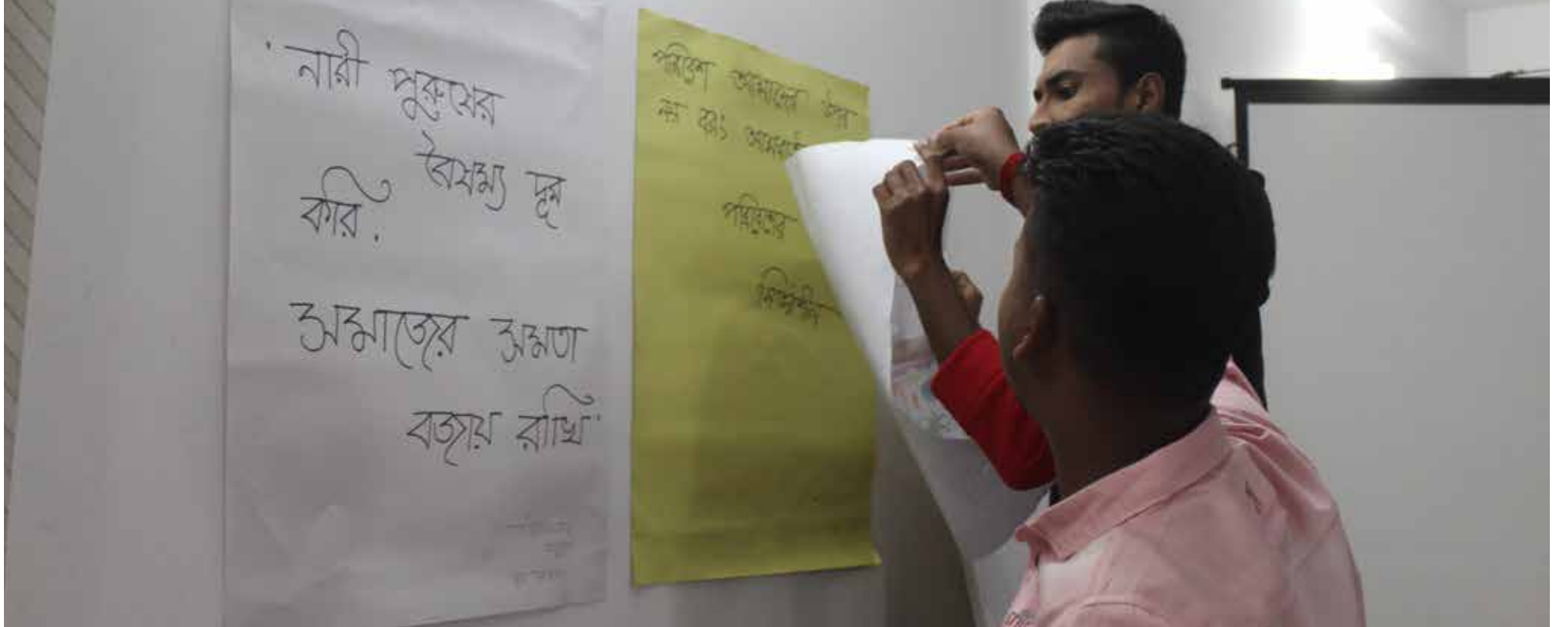




কৃষি প্রতিবেশে সুরক্ষায় ও মানবজীবনে যুব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কৃষি প্রতিবেশে যুব সমাজের প্রবৃদ্ধি এবং উন্নতির জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা গুরুত্বপূর্ণ। যুবরা কৃষি সেক্টরে আগ্রহী হলে তাদের ক্ষমতা ও কৌশল বৃদ্ধি পাবে, এবং তারা নতুন ও নৈতিক ভাবে প্রস্তুত হয়ে কৃষি সেক্টরকে উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে।



বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলা এবং সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় যুবরা প্রতিবেশ নির্ভর কৃষি রক্ষায় কাজ করছে। এ ব্যাপারে তাদের কে সহায়তা করছেন গণগবেষক কৃষকরা। তাছাড়া যুবরা পরিবেশ সংরক্ষণে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি যেমন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঝড়, বন্যা ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা পেতে পরিবেশ বন্ধু গাছপালা লাগানো, প্রতিবেশ রক্ষায় পাখির আবাসস্থল নির্মাণ এবং কৃষি প্রতিবেশ সুরক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনসচেতনতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।



জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রতিবেশ





জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিপর্যয় দুটোরই সংমিশ্রণ ঘটেছে আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে। মানুষ সৃষ্ট নানা কারণে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটেছে আমাদের উপকূলীয় সাতক্ষীরা জেলায়। লবণাক্ততা যেনো প্রতিদিনের সঙ্গী হয়ে উঠেছে এই এলাকায়, যা শিশু ও নারী স্বাস্থ্যে ফেলছে বিরূপ প্রভাব। তাছাড়া লবণাক্ততা কৃষি ও প্রাণী বাস্তুসংস্থানের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে। মানুষ সৃষ্ট কারণেই এই পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে। তাছাড়া প্রতি বছর একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমনঃ বন্যা, জলোচ্ছাস কিংবা ঘূর্ণিঝড় এই এলাকার স্বাভাবিক জীবন যাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করে এবং কৃষি ও গবাদি পশু পালনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

নদী ভাঙ্গন

বগুড়ার বুক চিরে বয়ে যাওয়া যমুনা নদীর সাথে তার পাড়ে বসবাস করা মানুষদের জীবনের এক ধরনের ছন্দ আছে। নদীর এইপাড় ভাঙ্গে তো ওই পাড় গড়ে। মানুষের ঘর ভেঙ্গে যায়, কৃষি জমি বিলীন হয়ে যায় নদীর ভাঙ্গনে। এই অঞ্চলের মানুষেরা কিছুদিন পর পর জীবনকে শূন্য থেকে শুরু করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। নদীর ভাঙ্গনে মানুষের পেশা বদলে যায়, বদলে যায় মানুষের জীবনধারা। ছবিতে রশিদ হোসেন ভাঙ্গনের কবলে চলে যাওয়া তার চাষের জমির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। গত বছর তিনি এই জমিতে ভুট্টা চাষ করেছিলেন।



বগুড়ার সারিয়াকান্দীর যমুনা তীরবর্তী মানুষের
জীবনে নদী ভাঙ্গন একটি পরিচিত শব্দ।
প্রতিবছর নদীর পাড় ভাঙ্গে আবার মাঝখানে চর
জেগে উঠে আর ভাঙ্গন কবলিত ভূমিহীন
মানুষেরা সেখানে ঘর করে, কৃষিকাজ করে
জীবনযাপন করে, কিন্তু সে চরও বেশিদিন টিকে
না।





আবদুর রশিদের জন্ম এই নদীর তীরেই। তিনি বলেন একসময় এই যমুনা দেখতে আসতে তাদের ৩ ঘন্টা হাটতে হতো। কিন্তু পরে এই যমুনাই তাদের ঘর ৩ বার ভেঙ্গে নিয়ে যায়। তাদের যা কৃষি জমি ছিলো সেসবও বিলীন হয়ে যায় নদীতে, যখন চর জেগে উঠে তখন প্রভাবশালী লোকেরা চর দখল করে ফেলে। আবার কখনো চরে জমি পাওয়া গেলেও সে চরও কিছুদিন পর ভেঙ্গে যাচ্ছে, পরে উনি দিন মজুর হিসেবে না না কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করতেন, কিন্তু বয়সের ভারে তাকে আবার পেশা পরিবর্তন করে যমুনার চরে ভেড়া পালনে যুক্ত হতে হয়েছে। চরগুলো পশু পালনের জন্যেও কৃষকেরা ব্যবহার করে থাকেন।

বছরের একটা সময় এই উপরালে শুরু হয় খরা, লবণাক্ততা মাটিকে শুষ্ক ও রক্ষ করে তোলে। ফলে চাষের ব্যাঘাত ঘটে। মাটিতে পানির পরিমাণ কমে যায়, জমিগুলো ফেটে যায়, জমিকে চাষ উপযোগী করতে সমস্যা হয় কৃষকদের। এমনিতেই লবণাক্ততার ব্যাপক বিস্তারের ফলাফল হিসেবে চাষের উৎপাদন কমে গিয়েছে, এর সাথে খরা যুক্ত হয়ে কৃষকদের জীবনকে আরো কঠিন করে তুলছে।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়



পরিবেশ বিপর্যয় একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। এর প্রতিক্রিয়া বহুমাত্রিক, অনেক ক্ষেত্রে জীবন বিপন্নকারী। বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। দেশটির ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব দিনদিন বেড়ে চলেছে। জনসংখ্যার আধিক্য, অপরিবর্তিত নগরায়ন, বনভূমি উজাড় হয়ে যাওয়া, সুষ্ঠু নদী ব্যবস্থাপনার অভাব, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং মানুষের জ্ঞান ও সচেতনতার ঘাটতির কারণে এই সমস্যা সময়ের সঙ্গে প্রকট হচ্ছে। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো জাতীয় সমস্যা মোকাবেলার জন্য জ্ঞান-সচেতন ও প্রশিক্ষিত হওয়া খুব জরুরি। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অধিকাংশ সময়ে ফসলের ক্ষতি হয়ে থাকে। বন্যার ফলে জমি পানিতে তলিয়ে ধান, পাট, সবজি, শস্যসহ সব ধরনের ফসল নষ্ট হয়। ঘূর্ণিঝড়ের তীব্র বাতাসে ফসলের গাছ ভেঙে পড়ে এবং লবণাক্ত পানিতে জমি প্লাবিত হলে ফসলের উৎপাদন কমে যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ফসলের ক্ষতি দেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। ফসলের ক্ষতির ফলে খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয় এবং খাদ্যের দাম বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও, কৃষকদের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়।

লবণাক্ততা

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ, এবং নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এই অঞ্চলের মানুষ তাদের জীবিকা, জমি, এবং ঐতিহ্য হারানোর ঝুঁকিতে। লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ কৃষিক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। মিঠা পানির অভাবে ধান চাষ, যা সাতক্ষীরা অঞ্চলের প্রধান জীবিকা, ক্রমশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। অনেক কৃষক ধানের বদলে লবণাক্ত পানিতে টিকে থাকতে পারে এমন ফসল, যেমন চিংড়ি এবং সামুদ্রিক মাছ চাষের দিকে ঝুঁকছেন। এই পরিবর্তন কেবল কৃষিক্ষেত্রেই নয়, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনেও বিরাট প্রভাব ফেলেছে। লবণাক্ত পানির কারণে পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। জীবিকার উপর নির্ভরশীলতা কমে যাওয়ায় অনেক মানুষ বেকারত্বের সমস্যায় জর্জরিত।





নব্বইয়ের দশক থেকে রপ্তানি বাজারে চিংড়ির ক্রমবর্ধমান চাহিদা তৈরির পর থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির সুবিধা নিয়ে বহিরাগত ব্যবসায়ীরা অনৈতিক ক্ষমতাপ্রয়োগ এবং স্থানীয় বড় জমির মালিকদের সাথে যোগসাজেশে ধান এবং অন্যান্য ফসলকে সরিয়ে নোনা পানির চিংড়ি চাষ করতে শুরু করে। ফলে পরবর্তী দশ বছরে সেখানকার প্রায় শতভাগ কৃষি জমি লবণাক্ত পানির চিংড়ির খামারে পরিণত হয়েছে। মিঠা পানির উৎস পুকুরগুলোও এই চিংড়ি চাষের আওতায় চলে যায় এবং এই চর্চা এখনো অব্যাহত রয়েছে।

কামরুন্নেসা উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা, তারাই লবণাক্ততার সবচেয়ে মারাত্মক স্বীকার। তিনি বলেন লবণাক্ততার ফলে তাদের দৈনন্দিন কাজের মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটছে। তাদের সারাদিন থাকতে হয় পানির সাথে, গৃহস্থের ধোয়ার কাজ থেকে শুরু করে, গোসল করা, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি সব কাজে নানা সমস্যা তৈরী করছে এই লবণাক্ততা। লবণ পানিতে গোসলের ফলে ত্বকের নানা সমস্যা, নারীদের শারীরিক সমস্যা, বাচ্চাদের গলগন্ড, ডায়রিয়া ইত্যাদি রোগ দেখা দিচ্ছে।



সুপেয় পানির সংকট





পৃথিবীতে স্থানের ভিন্নতার কারণে খাবার পানি ও কৃষিতে ব্যবহারের পানির ব্যবস্থাপনায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সব স্থানের পানি ব্যবস্থাপনা এক নয়। পানির অপর নাম জীবন। বিশেষ করে যেসব এলাকায় পানির সংকট সেসব এলাকার মানুষের জীবন ধারণ ও খাদ্য উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান পানি। কেননা এই পানি যদি বিশুদ্ধ না হয় তাহলে তা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বাংলাদেশে সুপেয় পানির চরম-সংকট পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের সুপেয় পানির চরম-সংকটের একটি উদাহরণ হলো দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলা। এই এলাকার পানি লবণাক্ত হওয়ায় এখানে সুপেয় পানির রয়েছে, যা জীবনকে কঠিন করে দিচ্ছে।





কৃষক ও গবেষণা সহকারীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ইন্ডিয়া থেকে আগত কৃষি প্রতিবেশ বিশেষজ্ঞ ড. দেবল দেব



কৃষকদের জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারণে একচেঞ্জ ভিজিট কর্মসূচি



কৃষিমেলায় আগত অতিথিবৃন্দ রিইবের প্রকাশনা দেখছেন



প্যানডেমিক করোনাকালীন সময়ে জৈব কৃষি মেলা

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ-এর কৃষি-প্রতিবেশ বিষয়ক যাত্রা

কৃষি এবং কৃষির অবস্থান নিয়ে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ একশন রিসার্চমূলক গবেষণা কাজ শুরু করে ২০১৩ সাল থেকে। গণগবেষণা পদ্ধতি এই সকল কাজে টুলস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সময়ে কৃষির সমস্যা এবং সমাধানের পথ অন্বেষণে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, কৃষিবিদ, গবেষক, নাগরিক সমাজ, স্থানীয় নেতা, রাজনীতিবিদ এবং সরকারের সাথে সম্পর্কিত বিশেষ ব্যক্তি, সংস্থার সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপ, সাক্ষাৎকার এবং গ্রুপ মিটিংয়ের মাধ্যমে কৃষির পরিবর্তনের প্রভাব, কৃষির সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করেছে। এ বিষয়ে রিইব বিভিন্ন প্রকাশনাও করেছে।

পরবর্তীতে রিইব কৃষি প্রতিবেশ নিয়ে ২০১৬ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সরাসরি একশন রিসার্চের মাধ্যমে কাজ করে আসছে। এসব কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের সমস্যা, জলবায়ু পরিবর্তন, জলবায়ু স্মার্ট কৃষি, কৃষি প্রতিবেশ সংরক্ষণ, নারী কৃষক, কৃষিতে নারীর কাজ, কৃষি শ্রমিক, শ্রেণী সম্পর্ক ও যুব নেতৃত্ব।

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ জ্ঞানচর্চার ভিত্তিতে যে কাজ করে তার মূল লক্ষ্য প্রতিবেশ ও জেডার ন্যায্যতা বাস্তবায়ন করা এবং তা সর্বসাধারণে প্রচারের জন্যে বিভিন্নভাবে কাজ করা। এসব কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: কৃষি প্রতিবেশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি সংগঠন, প্রধান রাজনৈতিক দল, কৃষক সংগঠন, উন্নয়ন কর্মী, শিক্ষক, মিডিয়া এবং নীতিনির্ধারকদের সাথে সংলাপ এবং সেমিনার; আবাসিক কর্মশালা, আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন; মাঠ দিবস উদযাপন; কৃষি মেলা, একচেঞ্জ ভিজিট, কৃষক ক্যাম্প, কৃষি-প্রতিবেশ নির্ভর নিরাপদ ফসল, খাদ্য, উৎপাদন, সংগ্রহ এবং বিক্রি করার জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরী করা; জাতীয় যুব সম্মেলন আয়োজন করা; কৃষক এবং বিভিন্ন সংগঠনের সাথে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা।



কৃষক নারীদের জেভার ও কৃষি বিষয়ক স্কুল



রোসা লাজেবার্গ স্টিফটুং-এর দিল্লী প্রতিনিধি ভিনোদ কস্টি ফিল্ড ভিজিটে গিয়ে কৃষকদের সাথে আলাপ করছেন



কৃষকদের কৃষি প্রতিবেশ বিষয়ক স্থানীয় স্কুল



লোকজ গম্ভীরা গানের ফর্মে তৈরি “কৃষি প্রতিবেশের গান” তথ্যচিত্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান



স্থানীয় পর্যায়ে যুবদের সাথে কৃষি ও পরিবেশ বিষয়ক কর্মশালা



কৃষি ও জলবায়ু সংকট বিষয়ক জাতীয় ডায়ালগ



কৃষি ভূমি ও শ্রেণিসম্পর্ক বিষয়ে রিইব ও ফাউন্ডেশন ফর এগ্রোরিয়ান স্টাডিজ, ইন্ডিয়া-র ওয়েবিনার



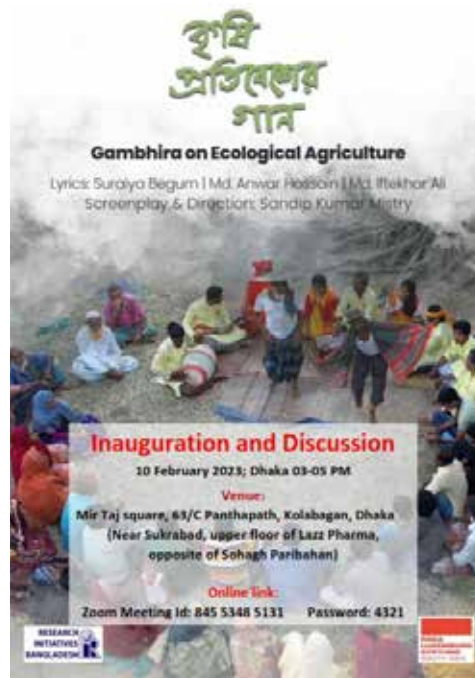
কৃষি প্রতিবেশ বিষয়ক পট গানের চিত্রায়ন



রিইব আয়োজিত “নিরাপদ কৃষি উদ্যোক্তা ক্যাম্প-এর বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখছেন অন্যান্য অতিথির সাথে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সাবেক মহাপরিচালক মো: হামিদুর রহমান এবং রিইব ভাইস চেয়ার পারসন ড. হামিদা হোসেন



যুব, পরিবেশ ও জেডার বিষয়ক সম্মেলন



১৬ রিইব-এর পোস্টার

সর্বোপরি সাতক্ষীরা, বগুড়া জেলার গণগবেষক কৃষকদের অভিজ্ঞতা ও সফলতার অডিও ভিজুয়াল প্রকাশনা, গম্ভীরা ও পটগান ফর্মকে ব্যবহার করে তথ্যচিত্র তৈরী করা। সবশেষে বলতে হয় প্রকাশনার কথা। এ পর্যন্ত কৃষি প্রতিবেশ নিয়ে তেতাল্লিশটা বই, বুকলেট বের হয়েছে। এসবেরই কিছু বালক এখানে তুলে ধরা হলো।



জেভার ন্যায্যতার প্রসারণে রিইব ২০২১ সালে বগুড়া, সাতক্ষীরা ও নীলফামারীর একদল কৃষক নারীদের জ্ঞানচর্চায় জেভার স্কুল পরিচালনা করা হয়। সেখানে নারীদের আয়বর্ধক কাজে উজ্জীবিত করার জন্যে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেখান থেকে উজ্জীবিত হয়ে রিইব এর প্রকল্প এলাকা বগুড়ার কয়েকজন নারী গণগবেষণা দলে আলোচনা করে “সুখদহ নারী উন্নয়ন সংগঠন” নামে একটি স্থানীয় নারী উদ্যোক্তা সংগঠন গঠন করেন। তারা এই সংগঠনের ব্যানারে বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার ফুলবাড়ি ইউনিয়নের তিনটি গ্রামে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন করছে। এই খাবার নিরাপদ কেননা জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা দ্রব্যের মাধ্যমে তা তৈরী হয়। এই সংগঠনের নারীরা নিজেদের উদ্যোগে একটি খাদ্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এই প্রতিষ্ঠানে তারা বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার তৈরি করেন এবং ক্ষুদ্র পরিসরে গ্রামের মানুষের কাছে সুলভ মূল্যে সরবরাহ করেন। এই উদ্যোগের ফলে নারী উদ্যোক্তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এছাড়াও, এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নয়নেও এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রথম দিকে তাদেরকে ছোট ছোট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু গণগবেষণার মাধ্যমে তারা সমাধান করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তারা নিজেদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করছেন এবং তাদের গ্রামে কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। এটি এলাকার নারীদের উন্নত অবস্থান অর্জন করেছে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াচ্ছে। তাদেরকে দেখে অন্যরাও আগ্রহী হয়ে উঠছে। সুখদহ নারী উন্নয়ন সংগঠনের এই উদ্যোগ একটি সামাজিক এবং আর্থিক পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে, যা এই অঞ্চলে নারীদের জীবনে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সহায়ক হতে পারে।

শিক্ষাগ্ৰনে কৃষি প্রতিবেশ চৰ্চা

বাংলাদেশের অধিকাংশ স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীর প্রকৃত অর্থে বাস্তবিক কৃষি জ্ঞান নেই। মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে কৃষি একটি বিষয়, কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষার্থী এটি বই পড়ার মাধ্যমে শেখে, মাঠে গিয়ে হাতে কলমে কাজ করার কোন সুযোগ তাদের হয় না। রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) প্রকল্পের কাজের মাধ্যমে নীলফামারী, বগুড়া ও সাতক্ষীরা জেলায় ২০১৯ সাল থেকে স্কুল শিক্ষার্থীদেরকে কৃষি প্রতিবেশ সম্পর্কে জানানোর মত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম শুরু করে। এই কার্যক্রমের লক্ষ্য ছিল সমসাময়িক কৃষি ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে সংবেদনশীল করে তোলা, দেশের উন্নয়নে কৃষি খাতের তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এবং তাদের কৃষি-প্রতিবেশ নীতির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে ১. বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার ফুলবাড়ী গমিরউদ্দিন বহুমুখী স্কুল এন্ড কলেজ, ২. নীলফামারীর সদর উপজেলার শাপলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, এবং ৩. সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার বংশীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়- এই তিন স্কুলের শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কৃষি প্রতিবেশ সম্পর্কে জানার জন্য সম্পৃক্ত করা হয়।

রিইব উক্ত স্কুল কর্তৃপক্ষের সম্মতি নিয়ে ক্যাম্পাসে একজন শিক্ষক ও কয়েকজন কৃষকের তত্ত্বাবধানে একটি প্রশিক্ষণ প্লট তৈরী করে। শুরুতে মাধ্যমিক ক্লাসের ২৫-৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়, যারা স্কুল সময়ের পরে এই প্লটটিতে জৈব পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে। শুরুতে তাদেরকে নিয়ে কৃষি-প্রতিবেশ বিষয়ে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কর্মশালা করা হয়। পরে তারা প্রতিবেশ নির্ভর চাষাবাদের বিভিন্ন কৌশল হাতে কলমে চর্চা করে। যেমন, জৈব সার ও বালাইনাশক তৈরী করা, মিশ্র চাষ, জমিতে অনুজীব বৃদ্ধি, উপকারী-অপকারি পোকা চেনা এবং আমাদের প্রতিবেশ অনুযায়ী কোন ধরনের ফসল চাষ করা এবং গাছ লাগানো উচিত সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী করা হওয়া।

স্কুল প্লটে উৎপাদিত ফসল শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকেরা খেয়েছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে তাদের অভিমত ছিল খুবই ইতিবাচক। তারা কৃষি-প্রতিবেশ বিষয়ে কৃষকদের জ্ঞানের প্রশংসা করেন এবং বেশ কয়েকজন শিক্ষক উজ্জীবিত হয়ে নিরাপদ খাদ্য তৈরির জন্য স্বল্প পর্যায়ে কৃষি-প্রতিবেশভিত্তিক চাষ শুরু করেন। তারা বিদ্যালয়ের কৃষি প্লটটিকে ছাত্র, অভিভাবক এবং

প্রতিবেশী কৃষকদের মধ্যে কৃষি-প্রতিবেশ চর্চার একটি চমৎকার মডেল হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন। তাদের মতে এই

ধরনের কার্যক্রম দেশের সব স্কুলগুলোতে ছড়িয়ে

দেওয়া দরকার। আজকের শিক্ষার্থীরাই

একদিন দেশ পরিচালনা করবে এবং

তাদের হাত ধরেই জীববৈচিত্র্য

নির্ভর কৃষি ও প্রতিবেশ

সংরক্ষিত হবে।



আনসার আলী : কৃষি প্রতিবেশ চর্চায় অগ্রগামী কৃষক

বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার ফুলবাড়ি ইউনিয়নের নয়াপাড়া গ্রামের আনসার আলী কৃষি প্রতিবেশ বাস্তবায়নকারী একজন প্রগতিশীল প্রান্তিক কৃষক। ২০১৪ সালে আনসার আলী প্রথম টমেটো বিক্রির মাধ্যমে লাখপতি আনসার আলী নামক এক শিরোনামে দৈনিক করতোয়া পত্রিকায় প্রথম আলোচনায় আসেন সেই সুত্র ধরেই রিইব-এর সাথে পরিচয়। সহায়তা করেন প্রকল্পের গবেষণা সহকারী বগুড়ার মো: আনোয়ার হোসেন।

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ্‌স, বাংলাদেশ (রিইব) এর কৃষক দলে ২০১৫ সালে যোগদান এর মাধ্যমে তার যাত্রা শুরু হয়। শুরুর দিকে গণগবেষণা বৈঠকে নিয়মিত কৃষকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধান শুরু করেন। ২০১৫ সালের ৮ মার্চ আনসার আলী রিইব এর মাধ্যমে ইন্ডিয়ান নদীয়া জেলার ফুলিয়া এবং উড়িষ্যা কৃষি প্রতিবেশ বিশেষজ্ঞ ড. দেবল দেবের খামার বসুধায় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তার প্রেক্ষিতে তিনি প্রতিবেশ নির্ভর কৃষি কাজের পদ্ধতির সাথে এবং বিভিন্ন দেশি ধানের বীজ এর সাথে পরিচিত হন। দেশে ফিরে এসে আনসার আলী রিইব-এর সহায়তায় রাজশাহীর তানোর উপজেলার ইউসুফ মোল্লার কাছ থেকে স্থানীয় জাতের ধানের বীজ সংগ্রহ করেন। এর পর সেগুলোর প্রদর্শনী প্লট করে স্থানীয় কৃষকদের রিইব আয়োজিত মাঠ দিবসে দেখানো হয়।

২০১৭ সাল থেকে আনসার আলী নিয়মিতভাবে স্থানীয় জাতের ধানের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করছেন। তার কাছে প্রায় ১২টি জাতের স্থানীয় ধানের বীজ সংগ্রহে রয়েছে। এই প্রদর্শনী প্লটের মাধ্যমে তিনি বীজ সংরক্ষণ, জাত পুনরুদ্ধার এবং অন্যান্য কৃষকদের দেশি ধান চাষে আগ্রহী করার চেষ্টা করছেন। আনসার আলীর বীজ ব্যাংক থেকে বীজ ছড়িয়ে গেছে গ্রামের অন্য কৃষকদের মাঝে। বালুয়ারতাইড় এবং মাঝবাড়ি গ্রামের কৃষকরা, গাবতলী উপজেলার কৃষকরা, নারচি গ্রামের কৃষকরাও এখন দেশি ধানের চর্চা করছেন। তাছাড়া বারসিক, ওয়ার্ল্ড ভিশন, তিলোত্তমা ইকোলজিকাল ফার্ম, নন্দিনী ইকোলজিকাল ফার্ম এর মত প্রতিষ্ঠান তার কাছ থেকে দেশি ধানের বীজ নিয়ে থাকেন।

আনসার আলী মনে করেন রিইব-এর গণগবেষণা কৃষকদের সমস্যা সমাধানে এবং তাদের চিন্তা-ভাবনার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রিইব-এর সহায়তায় তিনি আজ একজন সফল বীজ সংরক্ষণকারী এবং স্থানীয় জাতের ধানের বাস্তবায়নকারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। এর মাধ্যমে তাঁর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং জীবনবোধ উন্নত হয়েছে বলে তাঁর বিশ্বাস।



